মৈত্রীশ ঘটক রতন খাসনবিশ শৈবাল কর সুদক্ষিণা গুপ্ত
বিশ্বজিৎ মণ্ডল মানবসাধন বিশ্বাস অনিন্দিতা সেনগুপ্ত
পিনাকী চক্রবর্তী বিশ্বজিৎ ধর শুভেন্দু দাশগুপ্ত
অনির্বাণ চট্টোপাধ্যায় স্বপ্নেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়
অম্বর ঘোষ শৌভিক মুখার্জী সেবক জানা
সঞ্জয় মুখোপাধ্যায় সমৃদ্ধ দত্ত
অনিন্দ্য ভুক্ত

বঙ্গীয় অর্থনীতি পরিষদ
(বেঙ্গল ইকোনমিক অ্যাসোসিয়েশন)
৮৭/২৭৭, রাজা এস.সি. মল্লিক রোড,
গাঙ্গুলী বাগান, কলকাতা ৭০০০৪৭

একশো ষাট টাকা

অর্থনীতি এই সময় ১.১

অর্থনীতি
এই সময়

১.১

মৈত্রীশ ঘটক রতন খাসনবিশ শৈবাল কর
সুদক্ষিণা গুপ্ত অম্বর ঘোষ পিনাকী চক্রবর্তী
বিশ্বজিৎ মণ্ডল অনির্বাণ চট্টোপাধ্যায়
স্বপ্নেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়

লেখা ও লেখক

অসাম্য নিয়ে যুক্তি তক্কো আর তথ্য
মৈত্রীশ ঘটক ৭

আচরণবাদী অর্থনীতি: তত্ত্বের সঙ্কট
রতন খাসনবিশ ১৪

নাগরিকত্ব বিবাদ: অর্থনৈতিক প্রভাব বিচার্য নয়?
শৈবাল কর ২৪

পরজীবী
স্বপ্নেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় ২৯

ভারতবর্ষের সড়ক পরিবহন নীতির বিবর্তন
সুদক্ষিণা গুপ্ত ৩৫

সমকালীন আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের প্রেক্ষিতে উৎপাদনের সংযুক্তিকরণ বনাম খণ্ডিতকরণ
বিশ্বজিৎ মণ্ডল ৪৬

পুঁজিবাদ, গণতন্ত্র ও সাধারণ মানুষ
অম্বর ঘোষ ৬১

ন্যূনতম সহায়ক মূল্য ও ভারতীয় কৃষি
সেবক জানা ৬৭

আমাদের দেশের অর্থনীতির হাল এখন
বিশ্বজিৎ ধর ও শুভেন্দু দাশগুপ্ত ৭৯

অন্য ইকোনমি
সমৃদ্ধ দত্ত ৮৫

আধুনিক অর্থনীতিতে অ্যাডাম স্মিথের প্রাসঙ্গিকতা
শোভিক মুখার্জ্জী ৯৩

মানব উন্নয়নের মূল্যায়ন এবং তার বহুমাত্রিকতা
মানবসাধন বিশ্বাস ৯৮

নিয়মিত বিভাগ

রোজকার অর্থনীতি
পিনাকী চক্রবর্তী ১০৬

বিশেষ গবেষণা নিবন্ধ

ভারতীয় প্রবীণ নাগরিকদের স্বাস্থ্যমূলক কল্যাণের পরিস্থিতি:
এনএসএসও-র ৭৫তম গৃহস্তরের সমীক্ষা থেকে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে কিছু অনুমান
অনিন্দিতা সেনগুপ্ত ১১০

বাজেট

বাজেট ঘাটতির রকমফের
অনিন্দ্য ভুক্ত ১২৫
নীতির ভুলে বাজেট
সঞ্জয় মুখোপাধ্যায় ১২৯

লেখা পাঠানোর নিয়মাবলী

পাণ্ডুলিপি তৈরি করতে হবে ওয়ার্ড ফাইলে, ইউনিকোডে টাইপ করে। যারা টাইপ করে লিখবেন না তারা হাতে লেখা পাণ্ডুলিপি স্ক্যান করেও পাঠাতে পারেন।

লেখার শব্দসংখ্যার উর্ধ্বসীমা সংক্রান্ত কোনও বিধিনিষেধ নেই তবে লেখাটির ন্যূনতম শব্দসংখ্যা ২০০০ হওয়া বাঞ্ছনীয়।

প্রতিটি লেখার শেষে তথ্যসূত্র অপরিহার্য। লেখার মধ্যে তথ্যসূত্রের উল্লেখ থাকবে এভাবে: (লেখকের পদবি, প্রকাশের বছর)। লেখার শেষে তথ্যসূত্র লেখা হবে এভাবে; লেখকের পদবি, নাম (প্রকাশের বছর); প্রবন্ধের নাম; প্রকাশনা সংক্রান্ত তথ্য।

পাণ্ডুলিপির শেষে লেখকের ইমেইল আইডি, ফোন নাম্বার ও যোগাযোগের ঠিকানা দিতে হবে।

লেখা শেষে লেখকের একটি সংক্ষিপ্ত জীবনীপঞ্জি প্রয়োজন সংক্ষিপ্ত জীবনীপঞ্জি তৈরি না থাকলে পূর্ণাঙ্গ সিভি থেকেই আমাদের সম্পাদনা সহযোগীরা তা তৈরি করে নেবেন।

লেখা পাঠান এই মেইলে: arthanitibea@gmail.com

অসাম্য নিয়ে যুক্তি তক্কো আর তথ্য

মৈত্রীশ ঘটক

১

রাজনৈতিক পরিসরে অসাম্য বিষয়টি একইসাথে যেভাবে আবেগ এবং বিতর্ক তোলে, অন্যান্য অর্থনৈতিক বিষয় নিয়ে অতটা সাধারণত ওঠে না। তার কারণ মনে হয়, 'অসাম্য'-এর ধারণাটির মধ্যেই কতগুলো দ্বন্দ্ব নিহিত আছে। যেমন, মানুষে মানুষে কোনও বৈশিষ্টের ক্ষেত্রেই 'সাম্য' সচরাচর চোখে পড়ে না— সে দৈর্ঘ্য-প্রস্থ, শারীরিক বা বুদ্ধিগত ক্ষমতা বা দক্ষতা যাই হোক না কেন। তাই, একভাবে দেখলে যেকোনো ক্ষেত্রে সাম্য নয় অসাম্যই প্রত্যাশিত ফল, অথচ 'অসাম্য' কথাটির মধ্যেই নিহিত আছে ব্যাপারটি কাম্য নয়। শুধু তাই নয়, 'অসাম্য' ধারণাটির মধ্যে একটা আপেক্ষিক তুলনা আছে, আর তুলনা এলেই মতভেদ হবার সম্ভাবনা বেড়ে যায়, কারণ আমরা কোন পক্ষের প্রতি কতটা সহানুভূতিশীল হব তা নির্ভর করছে অসাম্যের কার্যকারণ নিয়ে আমাদের সাধারণ চিন্তাভাবনা বা বিশেষ পরিস্থিতিতে তার সম্পর্কে আমাদের মূল্যায়নের ওপরে।

কতগুলো উদাহরণ নেওয়া যাক। অর্থনৈতিক বিকাশ বা পরিবেশ সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তার কাম্যতা নিয়ে নীতিগত কোনও মতভেদ নেই, কারণ এদের সুফল সবাই ভোগ করবেন। দারিদ্র-দূরীকরণের ক্ষেত্রে সবাই প্রত্যক্ষভাবে সুফল ভোগ না করলেও নীতিগত দিক থেকে এর ন্যায্যতা প্রশ্নাতীত। অসাম্যের সাথে মূল তফাৎ হল, এই ধারণাগুলির মধ্যে প্রত্যক্ষভাবে কোনও আপেক্ষিক তুলনা নেই, যা আছে, তা হল কোনো আদর্শ মাপকাঠির নিরিখে বাস্তব পরিস্থিতির তুলনা, যা নিয়ে মতভেদের অবকাশ কম। তবে হ্যাঁ, অসাম্যসহ উল্লিখিত সবকটি ক্ষেত্রেই এই লক্ষ্যগুলো সাধন করার পথ নিয়ে বা এর কোনো একটি লক্ষ্যসাধন করতে গেলে অন্যান্য লক্ষ্য কতটা ত্যাগ করতে হতে পারে বা এদের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রভাব ও তাদের ভালোমন্দ কী, এই সব বিষয় এসব নিয়ে দ্বিমত থাকতেই পারে।

অসাম্য প্রসঙ্গ নিয়ে যে বিতর্ক ওঠে তাকে প্রধানত তিনটে ভাগে ভাগ করা যায়: নীতিগত, চরিত্রগত ও ব্যবহারিক কৌশলগত।

লেখক : অধ্যাপক, লন্ডন স্কুল অফ ইকোনমিক্স

প্রথমত, অসাম্য কি মৌলিকভাবে অবাঞ্ছিত না অন্তত খানিকটা মাত্রায় অবধারিত এবং সহনীয়, এই নীতিগত প্রশ্নের উত্তর দেওয়া সোজা নয়। বামপন্থীদের মত সুকান্ত ভট্টাচার্যর এই বিখ্যাত পংক্তিগুলোর মধ্যে প্রতিফলিত: "বলতে পার বড়মানুষ মোটর কেন চড়বে? গরীব কেন সেই মোটরের তলায় চাপা পড়বে?" আবার দক্ষিণপন্থীদের মত হল, মানুষের মেধা, কর্মদক্ষতা, বা অন্যান্য গুণগুলোর মত আয় বা সম্পদের অসাম্যও অন্তত খানিকটা মাত্রায় স্বাভাবিক এবং তা মেনে নেওয়াই ভালো। কেউ যদি ন্যায্য উপায়ে উপার্জন করে ভালো মোটর গাড়ি কেনে, তাতে আপত্তির কি আছে? তবে, এক্ষেত্রেও অসাম্য ধারণাটির মধ্যে যে আপেক্ষিক তুলনা আছে, তা ছেড়ে দারিদ্র বা বঞ্চনা যে অবাঞ্ছনীয় তা নিয়ে বিতর্ক কম। সুকান্তের কবিতার খেই ধরে বলতে গেলে—বড়লোকের গাড়ি থাকাটা সমস্যা নয়, সমস্যা হল গরীবের তার তলায় চাপা পড়া।

দ্বিতীয়ত, কোন মাত্রায় অসাম্য মাপব—সম্পদ, না আয়? অসাম্য কি সুযোগের না ফলাফলের? যে বেশি পরিশ্রম করে বা বেশি উদ্যমী সে বেশি রোজগার করলে সমস্যা কোথায়? এগুলো অসাম্যের চরিত্র নিয়ে প্রশ্ন। ধরে নেওয়া যাক, অন্তত কিছুটা মাত্রায় ফলাফলের অসাম্য অবধারিত এবং তা না মেনে সরকার করব্যবস্থার (বা প্রত্যক্ষ পুনর্বণ্টনের) মাধ্যমে সমতা আনার জন্যে অত্যুৎসাহী হলে লোকে কাজ করার, উদ্যোগ নেওয়ার, নতুন কিছু উদ্ভাবন করার উদ্যম হারাবে। তাহলেও প্রশ্ন থেকে যায়, যারা সুযোগ পাচ্ছে তারা কি সবচেয়ে যোগ্য, সবচেয়ে দক্ষ, সবচেয়ে প্রতিভাবান? অর্থাৎ, প্রশ্নটি মেধাতন্ত্রের। কে অস্বীকার করতে পারে যে দারিদ্র্যের কারণে কত মানুষের স্বাভাবিক দক্ষতার বিকাশের সম্ভাবনা নষ্ট হয়ে যায়? আবার একইভাবে উল্টোদিকে বিত্তবান পরিবারের সমস্তরকম সুযোগ পাওয়া সত্ত্বেও গুণহীন কারো কোনও পেশার বা ক্ষমতাশীল আসনের সর্বোচ্চ স্তরে ওঠার উদাহরণও প্রচুর। এই দুইভাবেই সুযোগের অসাম্যের কারণে যোগ্যতা আর ফলাফলের মধ্যে ফারাক থেকে যায় এবং তাই সুযোগের প্রসারের জন্যে কর-ব্যবস্থার মাধ্যমে স্বাস্থ্য ও শিক্ষার ক্ষেত্রে সরকারি বিনিয়োগের স্বপক্ষে যুক্তিটি জোরদার।

এই সমস্যাগুলোর কারণে, অসাম্য নিয়ে আলোচনা উঠলেই অহেতুক বিতর্ক এবং বিভ্রান্তি সৃষ্টি হয়, যা পূর্বোল্লিখিত অর্থনৈতিক সূচকগুলির ক্ষেত্রে হবার সম্ভাবনা কম। অর্থনীতিবিদদের মধ্যে ফলাফলের অসাম্য নিয়ে ভিন্ন মত আছে— যেমন, অতি-উদারবাদী (লিবারটেরিয়ান)-রা মনে করেন অর্থনীতির পরিসরে প্রতিযোগিতা আছে, তাই খানিকটা অসাম্য অবধারিত, সেটাকে জোর করে নিয়ন্ত্রণ করতে গেলে, হিতে বিপরীত হতে পারে। কিন্তু সুযোগের অসাম্যের সমস্যাটি যে গুরুত্বপূর্ণ সেটা তাঁরা অস্বীকার করেন না। অন্যদিকে সমতাবাদী (ইগালিটেরিয়ান)-রা মনে করেন যে অর্থনৈতিক প্রতিযোগিতার প্রাঙ্গনে যে ফলাফলের অসাম্য দেখতে পাওয়া যায় তাতে জন্মসূত্রে কে কতটা সুবিধে নিয়ে শুরু করছে তার, এবং উদ্যম ও প্রতিভা বাদ দিয়ে ভাগ্যেরও বড়ো ভূমিকা আছে। তাঁরা তাই

সুযোগের এবং ফলাফলের অসাম্য দুই-ই যতটা কম হবে তত মঙ্গল মনে করেন। অর্থাৎ, অসাম্য নিয়ে দৃষ্টিভঙ্গী খুব আলাদা হলেও সুযোগের অসাম্যের সমস্যাটি দুইপক্ষই মানেন, যদিও কিভাবে সেটার মোকাবিলা করতে হবে তা নিয়ে তাঁদের অনেক মতবিরোধ আছে।

তাই তাত্ত্বিক বা মতাদর্শের জগৎ থেকে ব্যবহারিক জগতে আসতে গেলে, সুযোগের অসাম্য বাড়াতে গেলে কী করা যেতে পারে সেই ব্যবহারিক কৌশলের প্রশ্নটাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। আমূল সমাজ পরিবর্তন যদি আশু সম্ভাবনার তালিকায় না থাকে, তাহলে আলোচনার কেন্দ্রে থাকা উচিত করব্যবস্থা, আইনকানুন ও নিয়ন্ত্রণব্যবস্থা, আর শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের খাতে বরাদ্দ এবং সেই বিনিয়োগ কতটা কার্যকর তা নিয়ে। এখানে বিতর্কের অবকাশ আছে। সুযোগের অসাম্য বাড়াতে হবে এই নিয়ে ঐকমত থাকলেও কোনো নীতির ফলে একটা দেশের বিশেষ পরিস্থিতিতে কী হবে তা নিয়ে সবাই একমত হবেন এটা আশা করা যায় না। দুর্ভাগ্যের কথা হল, আমাদের দেশে অসাম্য প্রসঙ্গটি উঠলেই আলোচনাটা মতাদর্শগত দ্বন্দ্বের আবর্তেই অনেকটা ঘুরতে থাকে। একপক্ষ যদি বলেন "অর্থনৈতিক বৃদ্ধি হলে অসাম্য অনিবার্য", অন্যপক্ষ বলেন "উদারীকরণের পরে অসাম্য বাড়তেই থেকেছে"। দু'পক্ষের কথা আংশিকভাবে সত্যি, কিন্তু আসল প্রশ্ন হল, বৃদ্ধির সাথে অসাম্য বাড়লেও, বৃদ্ধির প্রক্রিয়ায় কি অর্থনৈতিকভাবে অনগ্রসর শ্রেণীর মানুষেরা সামিল হতে পারছেন, আর যদি তা যথেষ্ট মাত্রায় না হয়ে থাকে, তাহলে কীভাবে তার সুরাহা করা যেতে পারে, বৃদ্ধির প্রক্রিয়াটিকে কীভাবে আরও অন্তর্ভুক্তিমূলক করা যেতে পারে।

তর্ক ও তত্ত্ব ছেড়ে এবারে তথ্যের দিকে নজর দেওয়া যাক।

২

সদ্য অনুষ্ঠিত জাতীয় নির্বাচনের আগে বর্তমান সরকারের দশ বছরের শাসনে অর্থনৈতিক অবস্থার পরিবর্তন কেমন হয়েছে, কতটা হয়েছে এই নিয়ে আলোচনা ও বিতর্ক হওয়া স্বাভাবিক। এই বিতর্কের অনেকটা জায়গা জুড়ে ছিল অসাম্য বিষয়টি। গত এক দশকে বৃদ্ধির ফল কতটা সাধারণ মানুষের মধ্যে ছড়িয়েছে আর কতটা অতিধনীদের আরও ধনী করেছে এই নিয়ে যে বিতর্ক চলছিল বেশ কিছুদিন ধরে (বর্তমান সরকারের অর্থনৈতিক নীতির বিরুদ্ধে 'সুট-বুট কি সরকার' এই স্লোগানটি ২০১৫ সালে প্রথম শোনা যায়), তাকে জনপরিসরে উস্কে দিয়েছে নির্বাচনের কিছুদিন আগে প্রকাশিত একটি গবেষণাপত্র, যার নাম 'ভারতে আয় ও সম্পদের অসাম্য, ১৯২২-২০২৩: বিলিওনেয়ার রাজের উত্থান' (নীতিন কুমার ভারতী, লুকাস চ্যান্সেল, তোমা পিকেটি, এবং আনমোল সোমাঞ্চি, ২০২৪)। এর অন্যতম লেখক হলেন তোমা পিকেটি, বিভিন্ন দেশে অসাম্য নিয়ে যাঁর পরিসংখ্যানভিত্তিক কাজ গত দুই দশকে গবেষণা এবং অর্থনৈতিক নীতির জগতে সাড়া ফেলেছে সেই। আন্তর্জাতিক স্তরের গবেষকরা যখন ভারতের ক্রমবর্ধমান অসাম্যের প্রবণতার দিকে নজর দিচ্ছেন তখন নিশ্চয়ই কিছু একটা ঘটছে যা শুধুমাত্র রাজনৈতিক

বিতর্ক বা বিরোধীদের অপপ্রচার বলে উড়িয়ে দেওয়া যায় না।

পিকেটি এবং তাঁর সহ-গবেষকরা দেখাচ্ছেন যে ২০২২-২৩ সালে আয়ের নিরিখে জনসংখ্যার ধনীতম এক শতাংশ মোট আয়ের তেইশ শতাংশ অর্জন করেছেন, আর বিত্তের হিসেবে ধনীতম এক শতাংশ মোট সম্পদের চল্লিশ শতাংশ-এর মালিক। শুধু গত এক শতকের পরিপ্রেক্ষিতেই বর্তমান ভারতে অসাম্যের মাত্রা সর্বাধিক নয়, সারা বিশ্বের নিরিখেও ভারত এখন অসাম্যের নিক্তিতে একদম প্রথম সারিতে। উদারীকরণের সময় থেকেই অসাম্যের এই উর্দ্ধগামী প্রবণতা সুস্পষ্ট— ডলারের মূল্যে বিলিওনেয়ারের সংখ্যা ১৯৯১ সালে ছিল ১, ২০২২ সালে হয়েছে ১৬২। মনে রাখতে হবে, এক বিলিয়ন মানে ১০০ কোটি, আর টাকায় ডলারের মূল্য আশি ছাড়িয়েছে, তাই বিলিওনেয়ার মানে অন্তত ৮০০০ কোটির টাকার মালিক।

এর বিপক্ষে যে বক্তব্যগুলো এসেছে তাদের মোদ্দা কথা হল, অর্থনৈতিক বৃদ্ধির সাথে যেমন দারিদ্র কমে, তেমনি অসাম্যও বাড়ে কারণ বৃদ্ধির ফলে অর্থনৈতিক সুযোগের যে প্রসার হয় তার সদ্ব্যবহার করার ক্ষমতা বিত্তবান শ্রেণীর বেশি, তাই একটাকে চাইলে আরেকটাকেও মেনে নিতে হবে। তাই তার দিকে মনোযোগ না দিয়ে সামগ্রিক অর্থনৈতিক প্রগতির যাত্রাপথের দিকে নজর দেওয়া উচিত। বৃদ্ধির কারণে অর্থনৈতিক সুযোগের বিস্তার হয়, যার ফলে শ্রমের বাজারে মজুরি ও আয় বাড়ে এবং সরকরি রাজস্ব-কোষের আয়তন-বৃদ্ধি হয়, যার থেকে নানা জনকল্যাণমূলক নীতির ওপর ব্যয়ের ক্ষমতা বাড়ে। শুধু অসাম্যের বৃদ্ধির দিকে তাকিয়ে উদারীকরণ-পূর্ব জমানার প্রতি স্মৃতিমেদুরতায় ভুগলে চলবে না, কারণ সেই সময় অসাম্য তুলনায় কম ছিল ঠিকই, কিন্তু মাথাপিছু জাতীয় আয় ও তার বৃদ্ধির হারও কম ছিল, আর দারিদ্র ছিল অনেকটা বেশি।

এই যুক্তিটির বৈধতা নির্ভর করছে এই বৃদ্ধির প্রক্রিয়ার সুফল সমস্ত শ্রেণীর মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে, যাকে অন্তর্ভুক্তিমূলক (ইনক্লুসিভ) বৃদ্ধি বলা হয়ে থাকে, তার উপর। এর নানা লক্ষণের মধ্যে দেখা যেতে পারে, অসাম্য সত্ত্বেও দরিদ্রতর শ্রেণীগুলোর আয়েরও বৃদ্ধি যথেষ্ট হারে হচ্ছে কি না; শ্রমের বাজারে কর্মসংস্থান ও মজুরি যথেষ্ট হারে বাড়ছে কি না; করব্যবস্থা প্রগতিশীল কি না এবং যে যে খাতে সরকারি বিনিয়োগ থেকে দরিদ্রশ্রেণী সবচেয়ে লাভবান হন, সেগুলোর আপেক্ষিক গুরুত্ব বাড়ছে কি না।

আমার নিজস্ব গবেষণা থেকে দেখতে পাচ্ছি উদারীকরণ-পরবর্তী জমানায় আয়ের নিরিখে শীর্ষ এক শতাংশ এবং দশ শতাংশ গোষ্ঠীর আয় গড় বৃদ্ধির হারের থেকে অধিকতর হারে বেড়েছে। শুধু তাই নয়, নিম্ন পঞ্চাশ শতাংশ এবং মধ্যবর্তী চল্লিশ শতাংশ -এর বৃদ্ধির হার কাছাকাছি ছিল, এবং দুটোই ছিল গড় বৃদ্ধির হারের নিচে।

এখানে মনে রাখতে হবে, দরিদ্রশ্রেণীর আয় যেহেতু কম তাই শতকরা হারের হিসেবে তা বাড়া অপেক্ষাকৃতভাবে সোজা— যার ৫০০০ টাকা মাসে রোজগার, তার আয় দশ শতাংশ বাড়ানো, তার তুলনায় যার মাসে ৫০০০০ টাকা রোজগার, তার আয় দশ শতাংশ বাড়ানো পাটিগণিতের হিসেবেই আরও শক্ত। সেখানে যদি বিত্তবান শ্রেণীর আয়

বেশি হারে বাড়ে, তাহলে অসাম্য, যার মাত্রা এখনই উদ্বেগজনক অবস্থায়, তা সময়ের সাথে সাথে আরও বাড়তেই থাকবে। যদি ভাবেন বিশ্বের সর্বত্রই এক অবস্থা, তা কিন্তু নয়। উদাহরণ হিসেবে, চিনের ক্ষেত্রে গড় আয়-বৃদ্ধির হারের তুলনায় শীর্ষ এক শতাংশ এবং দশ শতাংশ গোষ্ঠীর আয় বৃদ্ধির হারের তফাৎ ভারতের মতোই, কিন্তু মধ্যবর্তী চল্লিশ শতাংশ এবং নিম্নতম পঞ্চাশ শতাংশ গোষ্ঠীর আয় গড় বৃদ্ধির হারের তুলনায় ভারতের থেকে অনেকটা বেশি হারে বেড়েছে।

শ্রমের বাজার নিয়ে সম্প্রতি একটি লেখায় দেখিয়েছি (মৈত্রীশ ঘটক, মৃণালিনী ঝা, ও জিতেন্দ্র সিং, ২০২৪) যে দেশের সার্বিক আয়বৃদ্ধির তুলনায় শ্রমের বাজারে কাজের গুণগত মান ও মজুরির বর্তমান চিত্রটি যথেষ্ট উদ্বেগজনক। কোনও শ্রমিক নিয়োগ না করা স্বনিযুক্ত কর্মী, ঠিকা শ্রমিক ও অবৈতনিক পারিবারিক শ্রমে নিযুক্ত কর্মীরা দেশের মোট কর্মরত জনসংখ্যার তিন-চতুর্থাংশ এবং গত এক দশকে মোট কর্মরত জনসংখ্যায় এদের অনুপাত বেড়েছে। মজুরির দিক থেকে দেখলেও, দেশের সার্বিক আয়বৃদ্ধির তুলনায় শ্রমজীবী শ্রেণীর গড় প্রকৃত আয়ের বৃদ্ধির হার নেহাতই অকিঞ্চিৎকর। তাই শ্রমের বাজার থেকেও যে ছবি ফুটে উঠছে তাতে বৃদ্ধির প্রক্রিয়া থেকে দরিদ্রতর শ্রেণীও যথেষ্ট উপকৃত হচ্ছেন, এই যুক্তিটি এখানে খাটছে না।

করব্যবস্থার দিকে যদি দেখি, তাহলে সম্প্রতি পেশ করা হল যে অন্তর্বর্তী বাজেট, তার তথ্য অনুযায়ী দেখা যাচ্ছে কেন্দ্রীয় সরকারের রাজস্বের আঠেরো শতাংশ আসছে জিএসটি এবং অন্যান্য অপ্রত্যক্ষ কর থেকে, আয়কর থেকে আসছে উনিশ শতাংশ আর কর্পোরেট কর থেকে আসছে সতেরো শতাংশ। অর্থাৎ, যে কর্পোরেট জগতের ধনীতম সদস্যেরা বিশ্বের ধনীতম ব্যক্তিদের তালিকার ওপর দিকে আছেন, সেই কর্পোরেট জগতের দেশের রাজস্বের জন্যে অবদান দরিদ্রতম শ্রেণীর মানুষেরা তেল-নুন-সাবান কেনার সময় যে কর দেন, তার মোট অবদানের থেকেও কম। শুধু তাই নয়, যদি গত কয়েক দশকের পরিসংখ্যান দেখি, ২০১০-১১ সালে মোট কর রাজস্বের ছত্রিশ শতাংশ আসছিল কর্পোরেট কর থেকে, আয়কর থেকে মাত্র সতেরো শতাংশ। তারপর থেকে কর্পোরেট কর থেকে আদায়ের অনুপাত কমতেই থেকেছে, এবং ২০১৯-২০ সালে বর্তমান সরকার এই করের হার অনেকটা কমিয়ে দেবার পর থেকে এর থেকে আদায়ের অনুপাত অধিকাংশ বছরেই আয়করের থেকে আদায়ের তুলনায় সমান বা কম থেকেছে। আর যদি কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের মোট রাজস্বে প্রত্যক্ষ বনাম অপ্রত্যক্ষ করের অনুপাত দেখি তাহলে দেখব আশির দশক থেকে অপ্রত্যক্ষ করের অনুপাত টানা কমছিল এবং প্রত্যক্ষ করের অনুপাত টানা বাড়ছিল। ২০০৯-১০ সাল থেকে ছবিটা পাল্টে যায়, মোট রাজস্বে অপ্রত্যক্ষ করের অনুপাত বাড়তে থাকে এবং প্রত্যক্ষ করের অনুপাত কমতে থাকে। সেই প্রবণতা গত এক দশকে আরও বেড়েছে। মনে রাখতে হবে, অপ্রত্যক্ষ কর কিন্তু আয়ের অনুপাতে প্রগতিশীল হারে আরোপিত হয় না, বরং তার উল্টোটা। যেমন, জিএসটি-র দুই-তৃতীয়াংশ মতো জনসংখ্যার নীচের পঞ্চাশ শতাংশের থেকে আসে, এক-তৃতীয়াংশ মধ্যবর্তী চল্লিশ

শতাংশ থেকে, এবং শুধুমাত্র ৩-৪ শতাংশ ধনীদের কাছ থেকে সংগৃহীত হয়। এছাড়াও মনে রাখতে হবে যে সম্পদের ওপর কর তুলে দেওয়া হয়েছে ২০১৬ সাল থেকে।

ভারতের মতো দেশে যেখানে জনসংখ্যার নব্বই শতাংশ এর বেশি আয়করের আওতার বাইরে সেখানে করসংগ্রহের প্রক্রিয়াটি সহজ নয় ঠিকই, কিন্তু তাহলেও করব্যবস্থার যে ছবিটা ফুটে উঠছে তাকে আর যাই হোক প্রগতিশীল বলা যায় না।

এবার সরকারি ব্যয়ের বরাদ্দের ছবিটা দেখা যাক। মোট সরকারি ব্যয়ে সামাজিক ক্ষেত্রের বরাদ্দ ২০১৪-১৫ থেকে ধরলে, এক অতিমারীর বছর বাদ দিলে, প্রায় একই থেকেছে, কুড়ি শতাংশ-এর কাছাকাছি। সামাজিক ক্ষেত্রের বরাদ্দের মধ্যে যদি শিক্ষার ক্ষেত্রে বরাদ্দের হার দেখি তা ধারাবাহিকভাবে নিম্নগামী। ২০১৪-১৫ সালে শিক্ষার ক্ষেত্রে ব্যয়ের অনুপাত কুড়ি শতাংশ থেকে কমে পনেরো শতাংশয় এসে দাঁড়িয়েছে। স্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে বরাদ্দের হার খানিকটা বেড়েছে, কিন্তু যেটুকু বেড়েছে তা নগণ্য বললেই চলে। সামাজিক ক্ষেত্রে মোট বরাদ্দের হারের নয় শতাংশ ছিল স্বাস্থ্যের খাতে, ২০১৪-১৫ সালে, তা ২০২৪-২৫ সালে বেড়ে হয়েছে এগারো শতাংশ। তবে হ্যাঁ, রেশন-ব্যবস্থায় অতিমারীর সময় থেকে বরাদ্দ খানিকটা বেড়েছে, যেমন তা বেড়েছে আবাসন, এবং পানীয় জল খাতেও। দেরিতে হলেও এবং খানিকটা হলেও সরকারি নীতির এই জনকল্যাণমুখী-অভিমুখ কাম্য। কিন্তু তাহলেও সার্বিক যে ছবিটা ফুটে উঠছে তা আশাজনক নয় তার কারণ, বৃদ্ধির প্রক্রিয়া অন্তর্ভুক্তিমূলক করতে গেলে যে নীতির গুরুত্ব নিয়ে কোনও বিতর্ক নেই তা হল সামাজিক ক্ষেত্রে বিনিয়োগের প্রয়োজনীয়তা, কারণ অর্থনৈতিক বৃদ্ধির সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে গেলে দরিদ্রশ্রেণীর মানুষের একমাত্র সোপান হল মানবসম্পদের বিকাশ। সরকারের অর্থব্যবস্থার নানা বাধ্যবাধকতা সত্ত্বেও সামাজিক ক্ষেত্রে বিনিয়োগে আরও গুরুত্ব দেওয়া যেত, একথা অস্বীকার করা মুশকিল।

৩

শেষ করার আগে উল্লেখ করা উচিত, অর্থনীতি আর রাজনীতি যেহেতু ওতপ্রোতভাবে জড়িত, তাই অসাম্যের কারণ ও প্রভাব বুঝতে গেলে রাজনীতির পরিসরের দিকেও নজর দিতে হবে। সাম্প্রতিক নির্বাচনী-বন্ড পর্ব থেকে সুস্পষ্ট যে অতি-ধনীরা শুধু করব্যবস্থা যথেষ্ট প্রগতিশীল নয় বলেই লাভবান তা নয়। তাঁরা রাজনৈতিকভাবে সক্রিয় এবং নানাভাবে সরকারি নীতির ওপর নিজেদের সুবিধার্থে প্রত্যক্ষ প্রভাব ফেলেন। এই নিয়ে অন্যত্র বিশদ আলোচনা করেছি (ঘটক ও মুখার্জি, ২০২৪) যার মূল বক্তব্য হল, নির্বাচনী-বন্ড অসাম্যের সমস্যাটা আরও অনেকটা বাড়িয়ে দেবার সম্ভাবনা বহন করে। যে পার্টি কেন্দ্রে বা রাজ্যে ক্ষমতায়, বন্ডের টাকার সিংহভাগ তারাই পাচ্ছে। কেন্দ্রে ক্ষমতাসীন বিজেপি বন্ডের টাকা পেয়েছে সবচেয়ে বেশি, কিন্তু অ-বিজেপি পার্টিগুলির কাছে বন্ডের যে টাকা গেছে তার সুবিধা পেয়েছে কয়েকটা মাত্র পার্টিই, তার মধ্যে পশ্চিমবঙ্গের তৃণমূল কংগ্রেস অন্যতম। এর ফলে আর্থিক সামর্থ্যের বিচারে ভারতীয় রাজনীতিতে

একটি অভূতপূর্ব অসাম্য তৈরি হয়েছে। এর ফলে নির্বাচনে অর্থপূর্ণ ভাবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারে এরকম পার্টির সংখ্যা ধীরে ধীরে কমে আসবে। অর্থনির্ভর রাজনীতির এই যুগে এই অসাম্য এক বিপজ্জনক সম্ভাবনার ইঙ্গিত বহন করে। আমরা ভারতে ইদানিংকালে যেমন দেখছি অর্থনীতির ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত হয়ে রয়েছে কয়েকটি সংস্থার হাতে, ঠিক তেমনই নির্বাচনী বন্ডের ফলে রাজনৈতিক ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত হতে পারে কয়েকটি পার্টির হাতে। এবং এই দুটি প্রবণতা পরস্পরকে বাড়িয়ে তুলতে পারে এবং তা যদি হয়, তাহলে অসাম্যের সমস্যা বাড়তেই থাকবে, বৃদ্ধির প্রক্রিয়ার ফল বিত্তবানদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে।

তাই অসমসাহসিক, থুড়ি, অসাম্যসাহসিক ছাড়া কারোরই ক্রমবর্ধমান অসাম্যের প্রবণতার পটভূমিকায় এই মুহূর্তে অন্তর্ভুক্তিমূলক বৃদ্ধির গপ্পোটিতে আস্থা রাখা মুশকিল।

তথ্যসূত্র

১. ভারতী, নিতিন কুমার, লুকাস চ্যান্সেল, থমাস পিকেটি অ্যান্ড আনমোল সোমাঞ্চি (২০২৪): ইনকাম অ্যান্ড ওয়েলথ ইনইকুয়ালিটি ইন ইন্ডিয়া, ১৯২২-২০২৩: দ্য রাইজ অফ বিলিয়নিয়ার রাজ, ওয়ার্ল্ড ইনইকুয়ালিটি ল্যাব ওয়ার্কিং পেপার ২০২৪/০৯

২. ঘটক, মৈত্রীশ, মৃণালিনী ঝা অ্যান্ড জিতেন্দ্র সিং (২০২৪): কোয়ান্টিটি ভার্সাস কোয়ালিটি: লং-টার্ম ট্রেন্ডস ইন জব ক্রিয়েশন ইন দ্য লেবার মার্কেট, দ্য ইন্ডিয়ান ফোরাম, জানুয়ারি ৩১, ২০২৪

৩. ঘটক, মৈত্রীশ অ্যান্ড অনির্বাণ মুখার্জি (২০২৪): ইলেকটোরাল বন্ডস, ইনকুম্বেন্সি অ্যাডভান্টেজ অ্যান্ড কনসেন্ট্রেশন অফ পলিটিক্যাল পাওয়ার, দ্য ইন্ডিয়ান ফোরাম, জুলাই ৭, ২০২৪